লেখকের অন্যান্য বই

মহা-নিষ্ক্রামণ

দীপশিখা

চার্ব্বাক

বিরহ-শতক

শিশুমনের চলচ্চিত্র

মনীষা

জীবনের চলস্রোত

চিরন্তনী

পত্নীব্রত

একলব্য

বিদ্যুৎ-শিখা

Bankimchandra :
His life and Art

ভূমিকা

১৩৪২ সাল ৩রা আশ্বিন শুক্রবার আমাদের তৃতীয় সন্তান গীতার জন্ম হয়। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া সহরে আমরা তখন থাকিতাম। আমাদের বাড়ীটি ছিল চমৎকার। দক্ষিণ-মুখী গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র—প্রবেশ-তোরণে মধুমালতী ও এলামণ্ডার কুসুমস্তবক। চারি পাশে ফুলের কেয়ারিতে নানাবিধ ঋতুপুষ্প। গোলাপও অজস্র ফুটিত। এই ফুলের বাসরে ফুলের হাসির মত সে জন্ম নিয়াছিল।

তাহার জন্মকালের ঘটনা লইয়া মায়ের কোল গল্পটি লিখি। গল্পের খোকা কুমার সত্যজিৎ, গল্পের খুকু কুমারী মঞ্জু। দিনে দিনে শশিকলার মত সে বাড়িয়া উঠিল। তাহার অফুরন্ত হাসি সকলকে মুগ্ধ করিত। ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসে আমি বিলাত যাই। সে ২২শে ভাদ্র সোমবার চলিয়া যায়। সে যেদিন যায়, সেদিন আমি এডিনবরা সহরে। তাহার মৃত্যু সংবাদ আমি পাই না।

দেশে ফিরিয়া হাতিয়ায় বসিয়া গীতা-স্মৃতি নামে পঁচিশটী সনেট

লিখি এবং মৃত্যুর আড়াল নামক গল্পটি লিখি। গীতা-স্মৃতি ১৩৪৪ সালের ৩০শে কার্ত্তিক সমাপ্ত হয়।

তিনটি লেখাই দীপিকায় বাহির হয়। শোক একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত সেই দুঃখপ্রকাশ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখই সাহিত্যের মূল উৎস, তাই ইহাকে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। শোকার্ত্ত মানুষের যদি ক্ষণিক সান্ত্বনা হয়, তবেই ইহার সার্থকতা।

মৃত্যু চিরন্তন রহস্য। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াই আমরা সত্যের সন্ধান পাই। স্বর্গতা কুসুমকলিকা গীতার ক্ষণ-জীবনের সার্থকতা কি? তাহার জীবনে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইল? সে তর্ক নিষ্ফল, তবু মনে বারে বারে জাগে।

জনম মরণ
অনন্ত রহস্য ভরা হেঁয়ালি গভীর,
না জানে উত্তর কেহ, প্রশ্ন চিরন্তন
মানুষেরে চিরকাল করেছে অধীর।

শোকাতুরা জননীর তর্কে মনে বিদ্রোহ জাগে। সে মঙ্গলকে দেখিতে ভোলে, আর্ত্ত বেদনায় কহে,

অন্ধ জড় শক্তি মোরা তার ক্রীড়নক
রব মৌন স্থির, রব চেয়ে নিষ্পলক।

বিদ্রোহী কবি বিধাতাকে অস্বীকার করে। মানুষের মধ্যে যে অমরত্ব, যে অমৃতত্ব আছে তাহারই প্রচার করে।

কাছে ছিল ছোট হয়ে সীমার আড়ালে
আজ সে যে গেছে প্রিয় জগতে ছড়ায়ে

খুসি মত   পাবে তারে হাতটি বাড়ালে,

যত খুসি   রাখ তারে বুকেতে জড়ায়ে।

মৃত্যুর এই শিক্ষা তুচ্ছ নয়। শোক বেদনায় মানুষ সান্ত্বনা চায়, অমৃত-প্রলেপ চায়। শাস্ত্র তাহাকে বলে—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং   ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ   সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আত্মা, নিত্য, অব্যয় ও অবিনাশি, এই সুগভীর তত্ত্ব অনুভব-সাধ্য করিতে অনেক সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু অমরত্বের দুইটি প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা সকলে দেখিতে পারি, তাহাকে দার্শনিকেরা বলেন Biological Immortality এবং Social Immortality. প্রথমটীর কথা চার্ব্বাকে লিখিয়াছিলাম—

প্রগতি আদর্শ হবে,

প্রগতি জীবন ধর্ম্ম। আমি মরে যাব,

চিতাকাষ্ঠে ভস্মীভূত হয়ে, নিভে যাব

কিন্তু বেঁচে রবে মহামানবতা; ব্যক্তি

আমি টুটে যাব, অগ্নির স্ফুলিঙ্গসম

ফুটেছিনু শক্তিপুঞ্জ হতে, পুনরায়

মিশে যাব শক্তির মাঝারে, নির্ব্বিশেষ

নিশ্চিহ্ন নির্গুণ,—বেঁচে রবে মোর আশা

মোর ভাষা, মোর গান, সাধনা আমার

মানুষের মাঝে।

সৌজাত্য বিদ্যা বলে যে মানুষের দোষ গুণ বংশপরম্পরায়

সংক্রমিত হয়। অতএব মানুষ সন্ততিদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে বলা যাইতে পারে।

বার্গসঁ বলেন মানুষের জীবকোষ চিরজীবি। Life is like a current passing from germ to germ through the medium of a developed organism. অতএব জীবকোষের মধ্য দিয়া অনন্ত অমর জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন—An invisible progress, on which each visible organism rides during the short interval of time given it to live. সন্তান-সন্ততিদের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড অংশ জীবনধারা প্রবাহিত।

কিন্তু দুঃখে সান্ত্বনা দিতে social or spiritual Immortality অতিশয় উপযোগী। ব্যক্তি মানুষ মরে, কিন্তু তাহার চিন্তাধারা, তাহার কর্ম্ম, তাহার ব্যক্তিত্ব সমস্ত জীবনে স্ফূর্ত্ত হইয়া ওঠে। এই হিসাবেই সমস্ত মহাপুরুষেরাই মৃত্যুহীন প্রাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

গীতা-স্মৃতিতে এই আত্মিক অমরত্বের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে সত্য, যে সুন্দর রূপান্বিত হইয়া ওঠে, তাহা নিঃশেষ হয় না। একজন দার্শনিকের কথা তুলিতেছি :—

The thought of social immortality should be a great comfort and an inspiration. Those in bereavement should consider that their lost ones are contin-

uing to live in them in their conscious memories in their ideals and in their actions. Would you keep alive the friend whom you have lost? Think of him often, be as he would have you be, carry out his plans, be true to his principles. Realize that so far as this world and its human associations are concerned, our lost ones can continue to live only in us. This is saddening, yes; but it is a comfort to know that they do live in us, if we will let them, and it is an inspiration to keep them living forces in the world. It is surely a more faithful service to them to keep them alive in this way than to abondon oneself to futile and corroding grief."—Wright.
গীতা-স্মৃতিতে ইহারই অনুরূপ অথচ একটু উচ্চস্বরের কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—

যে হাসি গীতার মুখে বিজলি-ঝলক
যে মধু মাধুরী তার ছিল অঙ্গে অঙ্গে,
চারিভিতে ছড়াও সে আলোর চমক,
দেখিবে যে এসে গেছে কি জানি কি রঙ্গে।

কিন্তু এই অমরত্বই সব নয়। মানুষ স্বপ্ন দেখিয়াছে, মানুষ ভাবিয়াছে সে মহাকালের মন্দিরে চিরজীবি হইয়া রহিবে। এই অমরত্বের কথা গীতা-স্মৃতিতে বলা হয় নাই। ব্যক্তি তাহার আশা

ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার কল্পনা, তাহার চিন্তা লইয়া পৃথক সত্ত্বা হিসাবে থাকিবে কিনা সে প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগিবে। তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা চার্ব্বাকের মত দেহবাদী ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন মানুষের চৈতন্য মস্তিষ্কের অবলম্বন বিনা প্রকাশ হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে এই মতবাদ তাহারা ত্যাগ করিয়াছেন।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি, তাহাদের তর্কজাল লইয়া আন্দোলন করিব না। আমার মনে হয় ব্যক্তিগত অমরত্বের একটা নৈতিক ও মধুর দিক আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। মানুষে মানুষে এই স্বাতন্ত্র্যই বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মূল কারণ। এই বৈচিত্র্যই সৃষ্টির আশ্চর্য্য লীলা। কবির মনে হয়, এই ব্যক্তিত্ব-কোরক নষ্ট হইতে পারে না। পুষ্প-তরুর শাখায় শাখায় অজস্র পুষ্প ফোটে, কিন্তু কোন দুইটিই বর্ণে গন্ধে, রূপে একরূপ নয়। তাই বিধাতার মঙ্গলময় রাজ্যে ব্যক্তিত্ব বিনাশ হইবে এ কল্পনা করিতে আমরা ভয় পাই। আমরা আশা করি ও বিশ্বাস করি এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুরণের জন্য সুযোগ ও অবকাশ মিলিবে। মৃত্যু যদি সব শেষ হয়, মৃত্যু যদি শাশ্বত ধ্বংস হয়, তবে গীতার জীবন নিরর্থক হয়। কল্যাণ-কৃৎ ভগবৎ সত্ত্বার সহিত এই অনুমানের বিষম বিরোধ হয়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিস্তৃতির ও অভ্যুদয়ের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা মৃত্যুতে একেবারেই নিঃশেষ হইবে, এই কল্পনা

করিলে বিশ্বসৃষ্টি দানবীয় কৌতুক বলিয়াই মনে হয়। যুগে যুগে কালে কালে সাধক ও মনীষিরা জীবনের রথ-ঘর্ঘরের পিছনে সত্য, শিব ও সুন্দরের পরিচয় পাইয়াছেন। যাহা সত্য ও কল্যাণ তাহা নিত্য নব অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া অনন্ত পরিসমাপ্তির দিকে চলিবে, এই কল্পনা যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের হৃদয়ের গোপন আশার অনুকূল। এইদিক দিয়া বিচার করিলে আমরা বলিতে পারি, ব্যক্তির নাশ হয় না, ইহলোকে তাহার যে অদর্শন ঘটিল, তাহা ক্ষণিক, কালান্তর এবং লোকান্তরে সে ব্যক্তি নূতন পরিবেশের মাঝে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিবে।

আমাদের শাস্ত্রে বারংবার আত্মতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। আমাদের দর্শনের সৌধভিত্তি আত্মতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন।

'ন বা অরে ভূতানাম্ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য : শ্রোতব্যো মন্তব্যো। নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।" মানুষ যে প্রাণিগণকে ভালবাসে, সে তাহাদের জন্য নহে, আত্মার প্রীতির জন্যই ভালবাসে। কাহার জন্যও কেহ প্রীত হয় না, সকলেই আত্মার জন্য প্রিয় হয়। অতএব আত্মাকে দর্শন করিবে, আত্মার কথা শুনিবে, মনন করিবে এবং ধ্যান করিবে, কারণ

আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান করিলেই সকলই জানা যায়।

বেদের যে গূঢ় তত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' তাহাই এই উপনিষদে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্মাই সর্ব্বান্তর্যামী বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সহিত এই অভেদ জ্ঞানই জ্ঞান। আত্মাকে জানিলেই সকল জানা হয়, কারণ আত্মাই জগতে অদ্বিতীয় বস্তু এবং আত্মাই জগন্ময় হইয়া ব্যপ্ত রহিয়াছেন। সংসারে যে দ্বৈত ভাব দেখি, তাহার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা অপসৃত হইলে আমরা বুঝিব যে আমরা সেই অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। ইহাই দর্শনের পরাকাষ্ঠা, ইহাই জ্ঞানের চরম তত্ত্ব। ব্যক্তি আমার 'মৃত্যুর পর কি পরিণতি হয়, দশম ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ নাই। পুরুষ যখন এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তখন প্রথমে বায়ুমণ্ডলে পরে আদিত্যমণ্ডলে যায়, তাহার পর 'স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমম্, তস্মিন বসতি শাশ্বতীঃ সমা।' ইহা হইতে ব্যক্তি ব্যক্তি হিসাবে থাকে তাহা বুঝিতে পারি।

ব্যক্তিগত অমরত্ব আমাদের নিকট সত্য এবং বাঞ্ছিত মনে হয়। মৃত্যুর পর ব্যক্তি আত্মা নূতন পরিবেশের মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের অভ্যুদয়ের যোগ করে, এবং প্রেম ও প্রীতির পরামাত্মা লাভ করে। ভক্ত ইহার চেয়ে অধিক বাঞ্ছা করেন না। কথায় বলে চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। দ্বৈতবাদের মতে জীবও ব্রহ্মের মধ্যে রহিবে এই ভেদ নিত্য ও শাশ্বত। এই ভেদ আছে বলিয়াই ভক্তি ও প্রেম সম্ভবপর।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা এই মুক্তিকে চরম বলেন না। তাহাদের মতে সাধক ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া মিলিয়া যান। সোঽহম্ এই জ্ঞানলাভ ইহ-জীবনেই সম্ভব। মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা এই অভেদ জ্ঞানলাভ। মানুষ যখন এই অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করে, তখন সে কি নিষ্ক্রিয় উদাসীন হইয়া যায়? পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সেই ভয় করেন। ফিক্টে তাই বলেন "To be one with such a God or Absolute would by no means imply a state of quiescence, but rather one of eternally creative intellectual activity. গীতাতে আমরা পাই ব্রহ্মভূত ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করেন না তাহার নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবৎ-কর্ম্ম হইয়া ওঠে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

ব্রহ্মাত্মসংবোধ হইলে মানুষ পরিপূর্ণ হয়। তাহার কর্ম্মশক্তি অনন্ত হয়, তাহার বোধশক্তি অসীম হয়, তাহার দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বাতিশায়ী হয়। এক হিসাবে এই মুক্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনষ্ট হয় কিন্তু সে বিধাতার চরম ব্যক্তিত্বে মিশিয়া আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করে। মানুষ যখন শান্ত ও

অসীম থাকে, তখন তাহার ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ। সে বিধাতার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া অনন্ত ব্যক্তিত্ব লাভ করে তখন সে শান্ত, সৌম্য এবং সম্পূর্ণ। রাইটের গ্রন্থে এই অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা তুলিতেছি—অনেকের নিকট তাহা সহজবোধ্য লাগিবে :—

To save our lives, we must lose them. As separate souls we must die ; to find our lives in God we must lose them as separate individuals, only thus we can achieve real Individuality and Personality. May not God eternally remember all the separate careers of all the separate souls, who are now sundered from him, but whose destiny it is to become ultimately united with him forever ? Each separate soul shall become one with all the rest in God. What is it now to love a Friend ? Is it not to have common joys, common understanding, common purposes and aspirations ? What bliss it will be in all eternity for all our thoughts and desires to become merged in a common Mind ! For reasons that we do not now understand, the World-Soul, to complete His purposes, has had to become partly

broken up into a lot of separate souls, each only a fragment of this Personality, with its part to perform for the good of the Universe as a whole. But when the task of each of these separate souls is completed and its debt of separate existence paid what more heavenly reward can it have than to return home again to God, and in identity with Him to think and plan and will and enjoy this universe to all eternity. How more completely could 'the chief end of man' be fulfilled."

তার্কিক প্রশ্ন করিবেন এই মিলনে জীবাত্মা তাহার নিজত্ব হারাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলে কি সুখ হইবে। অস্তিত্ব যদি বিনাশই হইল তবে মুক্তির প্রয়োজন কি? কেহ কেহ ইহার উত্তর দিয়াছেন,. তাহারা বলেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে মিলন বা মিলনেও জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে ইহাই বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ। বিলাতী পণ্ডিতদের কথাই তুলিতেছি :—

Our result is this : Despite God's absolute unity, we as individuals preserve and attain our unique lives and meanings and are not lost in the very life that sustains us and that needs us as its expression. This life is real through us all ; and we are real through our union with that life.

কিন্তু এই সকল সুগভীর তত্ত্ব আলোচনা ও সম্যক অনুধাবন করা সহজ নহে। মানুষের চিন্তায় অচিন্ত্যলোকের রূপ কিছুতেই ঠিক ধরা যায় না। কিন্তু এই অমরত্ব যদিও আমরা না পাই, গীতাস্মৃতিতে যে অমরত্বের কথা বলিয়াছি, সে পথ সমস্ত মানুষের পথে সহজ। দুঃখে ও শোকে আমরা সান্ত্বনা চাই, আমরা তৃপ্তি চাই। শোকার্ত্ত মানুষকে কল্যাণের পথ বলিয়া তাই অন্যায় করি নাই।

গীতাস্মৃতিতে যে বিদ্রোহের সুর আছে, সে বিদ্রোহ কাহাকেও পীড়া দিবে এ আশঙ্কা নাই। কারণ যিনি আত্মার পরমাত্মীয়, দুঃখে তাহার সহিত কলহ করিতে দোষ নাই।

হে স্বর্গিতা! তুমি আনন্দের বার্ত্তা নিয়া আসিয়াছিলে, তোমার অনিন্দ্য হাসি আমাদের জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে পাথেয় হইবে। তুমি আমাদের অন্তরে যে বাৎসল্য রস সঞ্চার করিয়াছিলে, সে রস নিঃশেষ হইবার নহে। তাহা দিনে দিনে ঘনতর হইয়া অমৃত হইয়া আমাদের ক্ষুধা মিটাইবে। যে আলোক ক্ষণিকের জন্য দেখিয়াছিলাম, সেই আলোকের দিকে লইয়া চলিবে। ধরণীর ধূলিতে যাহাতে আমরা ভুলিয়া না রহি, সেইজন্যই হয়ত তুমি চলিয়া গিয়াছ। নিশীথ রাত্রির তারকা খচিত আকাশের নিঃসীম ভূমার পানে চাহিয়া আমরা তোমাকে স্মরণ করিব, ফুলের বিকচ মাধুরী দেখিয়া আমরা তোমাকে মনন করিব। পৃথিবীর রূপে, রসে, গন্ধে, গানে তুমি রূপাতীত হইয়া আমাদিগকে অমর্ত্ত্য লোকের পানে আহ্বান করিবে।

তাই ত দুঃখ করি না, তাইত শোক করি না। তুমি আমাদের অমলিন স্মৃতি। সে স্মৃতি আশীর্ব্বাদের মত আমাদের জীবনকে ধন্য ও পুণ্য করিয়া তুলিবে। আমরাও কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বলিব :—

"What though the radiance which was once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour
of splendour in the grass, of glory in the flower ;
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind ;
In the primal sympathy
Which having bean must ever be ;
In the soothing thoughts that springs
Out of human suffering ;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.

হে সদানন্দময়ী পুষ্প কলিকা! তুমি দুঃ শোক হইতে আমাদের প্রীতির ও স্নেহের অর্ঘ লহ। মর্ত্ত্যের ও স্বর্গের মাঝে অমৃত সেতু স্থাপন কর।

হাতিয়ায় আমরা দুঃখ ও লাঞ্ছনা পাইয়াছিলাম, তাই সেখানেই তোমার স্মৃতি-দীপ্ত গীতা-পদক দিয়া আসি াছি। এমনই করিয়া বারংবার তুমি আমাদিগকে অকল্যাণের মাঝে কল্যাণকে দেখিতে

শেখাও, অসত্যের মাঝে সত্যের প্রকাশ বুঝাও, অসুন্দরের মাঝে সুন্দরের দীপ্তি দেখাও।

যে প্রেম ক্ষুদ্র ও শান্ত, সে প্রেমে আমরা তোমাকে দুর্ব্বল করিতে চাহি না। যে প্রেম জ্যোতিশিখায় উদ্ভাসিত হইয়া ক্রম-বর্দ্ধমান মহত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়, সেই অক্ষয় দিব্য প্রেমে তুমি আমাদিগকে চিরদিন উদ্‌বুদ্ধ কর।

চুঁচুড়া
মাঘ, ১৩৪৬

———

গীতা-স্মৃতি

মায়ের কোল

সকাল হইতেই খোকা ও খুকু মাকে দেখে নাই। তাই তাদের কোঁদলের অন্ত নাই। খোকা বড়, খুকু ছোট। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গিতেই মুখে জাগে—'মা'

সেদিন আর মায়ের দেখা নাই। বাবা বলিলেন, 'মায়ের পেটে ব্যথা হইয়াছে', শুনিয়া খোকা মাকে দেখিতে গেল, মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সকলের মুখ ভার ভার। খোকা খুকুদের তাই বাড়ী হইতে সাথীদের বাড়ী খেলিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সকালে তাহারা বেড়াইতে যায় না, তাই খুকুর বেশ আনন্দ হইল।

কিন্তু বেড়াইয়া ফিরিয়াও মায়ের দেখা না পাইয়া খুকুর দুঃখের অন্ত নাই।

খুকু আর থাকিবে না, মায়ের কাছেই যাইবে। তখন নূতন অতিথি আসিয়াছে।

ব্যস্ততার অন্ত নাই। খুকু ছাড়া পাইয়া মায়ের কাছে আসিয়া অবাক হইয়া চায়।

নূতন শিশুর ওঁয়া ওঁয়া ডাক শোনে আর বিস্ময় অনুভব করে। মাকে বলে, 'ওকে কোথায় পেলি মা?'

মা হাসে আর বলে—'ধাই বুড়ি ওকে নিয়ে এসেছে।'

'ওকে তাড়িয়ে দাও মা।'

খুকুর কোঁদল থামে না। রাজ্য হারাইলে কোন্ রাজার মন সুখী থাকে? খুকীর সাম্রাজ্য ছিল মায়ের কোল। সমস্ত বিপদের, সমস্ত আনন্দের নির্ভর আশ্রয়। সে হাতছাড়া হইতে চলিল। খুকু যেন তাহা বুঝিতে পারে, তাই কান্না তাহার বিস্কুট, চকোলেটে থামে না।

নিরুপায় খুকু ফেরে। তাহার আজ খাওয়ার তাড়া নাই। অনর্থক সে ঝি চাকরের কাছে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। পিসীরা খেতে দেয়, সান্ত্বনা দেয়—'ওকে ধাই বুড়ীকে দিয়ে দেবো'

এ কথায় খুকু খানিক শান্ত হয়। রাত্রে বাবার কোলে শুইয়া খুকুর মন খালি খালি লাগে। বাবা মা নয়, মায়ের স্নেহ মাধুরী বাপের কাছে মেলে না—খুকু যেন তাহা বোঝে। ঘুমাইয়াও তাই তার স্বস্তি নাই—সে খুঁত খুঁত করে—বাপের ঘুম ভাঙ্গায়—রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠে 'মার কাছে যাব।'

মাঝ-রাতে খুকু জাগিয়া ওঠে।

মন তার খালি খালি—জীবনে যে একটা মস্ত ফাঁক এসেছে, সে অব্যক্ত বেদনা তার মনকে অভিভূত করিয়া রাখে।

বাবার মুস্কিল। খুকু গল্প শুনিতে ভালবাসে।

বাবা বলেন 'গল্প বলি'

অন্যদিন খুকুর গল্প শুনিবার আগ্রহ অসীম। ঘুম-ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠে, আর অস্পষ্টস্বরে বলিয়া ওঠে—'বাবা গল্প বলো'—তারপরে ঘুমাইয়া পড়ে।

বাবা গল্প করেন—'এক বাড়ীতে চাঁদের মত ফুটফুটে একটী লক্ষ্মী মেয়ে আছে—ফুলের মতন তার হাসি—বাঁশীর মত তার মিষ্টি কথা'—

গল্প খুকুর ভাল লাগে না।

সে কথা বলে না, উৎকর্ণ হইয়া শোনে না। খানিক চুপ করিয়া থাকে তারপর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আকাশ-ভরা তারার মালা, কানন-ভরা ফুলের ডালা—আশ্বিনের শিউলির গন্ধ-বিহ্বল বাতাস বয়—বাবা খুকুকে বুকে করিয়া সান্ত্বনা দেন।

কিন্তু তার কান্না সর্ব্বহারার কান্না।

ভাষা নাই, কিন্তু তবু সে ব্যথা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাবা বলেন—'পূজোর বাজার হবে, তখন মেলা হবে—তখন পুতুল আনতে হবে।'

খুকুর মন একটুখানি ভোলে—বলে 'বড় পুতুল বাবা!'

কান্নার আবেগের সাথে ঘুমের আবেদনের যুদ্ধ চলে। ঘুম-পরীদেরই জয় হয়। খুকুর চোখে ঘুমের কাজল লাগিয়া যায়।

খুকুর দিনগুলি বিষম হইয়া উঠিয়াছে। মাকে কেন্দ্র করিয়াই তার জীবনের ছন্দ বাজিত। পিসী বলিয়াছে—'মায়ের কাছে যেতে নাই।'

খুকু তাহা মানে না। পিসীর চোখের আড়াল হইলেই সে ছোঁৎ করিয়াই মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

খোকার সাথে খুকুর বিচার চলে। খোকা বলে 'যাসনে টুলু! পিসী বারণ করেছে।'

খুকু শোনে না। নূতন শিশুর কান্না চলে—খুকু মাকে বলে 'মা ধাই ওকে কখন নিয়ে যাবে।'

মা বলেন 'ধাইকে দেব কেন! ও বড় হলে তোকে দিদি বলে ডাকবে।'

খুকুর চিন্তাজগতে বিপ্লব বাধে।

খুকুর একটী খুড়তুতো বোন আছে। তাকে সে দিদি

বলিয়া ডাকে। যে ওঁয়া ওঁয়া ডাকে, সে তাকে দিদি বলিবে—এটা বোধ হয় মন্দ কল্পনা নয়।

এই নূতন বোধকে হৃদয়ঙ্গম করিতে তার মনে দ্বন্দ্ব চলে। মাকে প্রশ্ন করে—'কখন বলবে ?'

মা হাসেন আর বলেন—'বড় হলে বলবে—যখন ওর কথা ফুটবে।'

খুকু নিজের অতীতের ছবি ভাবিতে চেষ্টা করে।

রাত্রে ঘুমের সময় দিনের চিন্তার সঙ্গে বিরোধ লাগে। বাবা ছিলেন বাহিরে—ঘুমের সময় গল্প করেছে খুকুর ভগবান্ দাদা।

ভগবান্ উড়িয়া চাকর—তার উড়িয়া গল্প খুকুর ভাল লাগে না।

মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙে—বাবার কাছে খুকু বলে 'মার কাছে যাবো।'

বাবা বলেন 'খুকু বড় হোক, তখন মা আমাদের ঘরে আসবে।'

খুকু বলে 'জানো বাবা ! আমায় দিদি বলে ডাকবে।'

মমতা ও হিংসার এই দোদুল দোলা বাবার মনে কৌতুক জাগায়।

বাবা বলেন 'নূতন মণিকে ধাইকে দিয়ে দেব ত ?'

খুকু বলে 'না। না—তা দেবো না।'

খুকু ঘুমায়। ভোরে জাগিয়া রাত্রির সঙ্কল্প ভুলিয়া যায়। ভোরে উঠিয়া মায়ের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে যায় আর বলে 'মা মণিকে ফেলে দে।'

মা বলেন 'আচ্ছা ধাই আসুক।'

খুকু শান্ত হয়, খেলিতে যায়।

খোকা ও খুকুর রাত্রি দিবা কলহ চলে। খোকা শান্ত, খুকু অশান্ত। খোকা কাগজ লইয়া একটা নৌকা করিয়াছে—খুকুর সেইটাই চাই।

খোকা হয়ত নৌকা দিয়া পড়িতে বসিল। খুকুর আর নৌকার প্রয়োজন নাই—তখন সে বই পড়িবে।

খুকু খোকাকে বলে 'মণি আমায় দিদি বলে ডাকবে।'

খোকা বই হারাইয়া খেলনা তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল, 'আমাকে দাদা বলে ডাকবে।'

খুকুর তাহা পছন্দ হয় না। একাধিপত্যের দুর্দ্দম বাসনা বোধ হয় মানুষের স্বাভাবিক। মণি একান্তই খুকুর হইবে—এ কল্পনায় আঘাত পাওয়া তাহার মোটেই ভাল লাগিল না।

খুকু ঝগড়া বাধাইল 'মণি আমায় ডাকবে, তোকে ডাকবে না।'

মীমাংসা কথায় নহে, কলহে পর্য্যবসিত হয়।

কয়েকদিন পরের কথা। মা আসিয়াছে। নূতন শিশু একপাশে শোয়, খুকু আর একপাশে। খুকুর তাহা পছন্দ হয় না।

মাকে সে সমগ্রভাবে পাইতে চায়—নূতন শিশুর আড়াল দিয়া মাকে পাওয়া নয়, হারানো।

খুকু তাই কাঁদে।

সে চায় অসপত্ন রাজ্য। তাই দিনের পর দিন তার হিংসা বাড়ে।

এক এক সময় হয়ত মায়া জাগে কিন্তু সে মায়া স্থায়ী হয় না।

খুকু মীমাংসা খুঁজিয়া পায় না। খুকুকে তাড়াইবার কল্পনা মন হইতে হয়ত মুছিয়াছে।

মাকে তাই বলে—'মা! মণিকে বাবার কাছে দাও।'

বুদ্ধির চাতুরী বটে, বাবার কাছে মণিকে দিলে মণিকে হারানো হইল না, কিন্তু মায়ের কোলকে ফিরিয়া পাওয়া গেল।

যাহা চাই তাহা পাই না—জীবনের ব্যর্থতার এই নিস্ফল প্রশ্ন খুকুর চিত্তে জাগে না—তাই তার চাতুর্য্যের মাধুর্য্যে সে খুসী হইয়া ওঠে।

গীতা-স্মৃতি

(১)

স্বর্গ থেকে ঝরেছিল, একটি মাণিক,
অকস্মাৎ একদিন কৌতুক খেলায়,—
তাই বুঝি পেয়েছিনু তোরে মা খানিক,
জীবনের দুঃখোদ্বেল বালুকা-বেলায়।
এত হাসি তাই বুঝি ছিল তোর মুখে,
গঙ্গার নির্ম্মল বুকে শুভ্রফেণধারা,
এত ভালবাসা তাই ছিল তোর বুকে,
করিত বিহ্বল মোরে, মুগ্ধ আত্মহারা।

স্বর্গের অমৃত কভু মর্ত্ত্যে কিবা রয়?
ক্ষণিকের স্বপ্ন যেন ক্ষণিকে মিলায়,
লুকালো মাণিক তাই, হাসি পেল ক্ষয়,
পারিজাত গন্ধ তার, আর না বিলায়।
একি কান্না? একি দুঃখ? একি ব্যথা রাশি?
কে দিবে উত্তর মাগো—? নাহি সেই হাসি।

(২)

ফুটেছিলি মোর গেহে, মর্ত্ত্যের অমৃত ফুল,
কি সে ভাগ্য আজ বুঝি, আজ জানি অশ্রুজলে,
দুর্ল্লভ অমরা বটে, নাহি সেথা তোর তুল,
মৃত্যু দিল উপহার দেবতার পদতলে।
আমরা কাঙাল বটে—ওঠে রিক্ত হাহাকার,
জননীর মর্ম্মভেদী—ওঠে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস—
আমাদের দীর্ণ বুক চেয়ে, দুঃখ দেবতার,
বক্ষে আছে চির অমলিন স্মৃতির সুবাস।

জরাহীন মাধুরী তাহার, চির দীপ্তি ভরা—
আমাদের ঘরে রবে—কেহ নাহি নেবে কাড়ি,
নন্দনে ফোটে না হেন পুষ্পকলি চিত্তহরা—
সে আছে হৃদয় ভরি—শুধু কায়া গেছে ছাড়ি।
কেনরে কাঁদিব মোরা? মৃত্যুরে করেছে জয়,
ধরণীতে রেখে গেছে অমৃতের পরিচয়।

(৩)

আজো মনে পড়ে মাগো ! সেদিনের কথা,
ছোট ছুটি তুলি মুঠি ডেকেছিলি পিছে ;
তবুত শুনিনি ডাক—বুঝিনি ত ব্যথা—
চলে গেনু ছেড়ে তোরে চলে গেনু মিছে।
সমস্ত পৃথিবী দেখি ফিরিলাম ঘরে,
কত দেশ দেশান্তর, কত নর নারী,
আগ্রহ ব্যাকুল চিত্তে এনু তোর তরে—
বিষণ্ণ ভবন কাঁদে—ঝরে অশ্রুবারি।

এত যে নিষ্ঠুর হবি হে অভিমানিনি !
দিবি ব্যথা মর্ম্মান্তিক করিবিনা ক্ষমা,
স্বপ্নেও সে কথা মাগো কভু ত জানিনি—
একি পরিহাস তোর, অয়ি নিরূপমা !
এ কঠোর অভিশাপ কেমনে সহিব ?
জীবনের দীর্ঘ পথে কেমনে বহিব ?

(৪)

সে কহিল মোরে, অশ্রুর পাথারে ভাসি,
বিদেশে গীতার কথা পড়েনি কি মনে ?
জাগেনি কি তার লাগি বুকে ব্যথা রাশি ?
দেখনি কি স্বপ্নে তারে নিশীথ শয়নে ?
কি কহিব ওরে মুগ্ধা কাতরা জননী !
আমি ছুটেছিনু বেগে দেশ দেশান্তরে,
বুঝি নাই, বুঝি নাই, পড়িল অশনি ;
শান্তি-ভরা স্নেহ-ভরা মোর কুঁড়ে ঘরে ।

সে নিল ফিরায়ে মুখ, কহিল না কথা,
বুকে তার শোক-বিষ ফেনাইয়া ওঠে,
ভাষা নাহি পায় তার উদ্বেলিত ব্যথা,
দুঃখে ক্ষোভে বেদনায় চিত্ত তার লোটে ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহি, অপরাধী প্রায়,
জানি গুরু অপরাধ, ক্ষমা নাহি হায় !

(৫)

হয়ত বাসিনি ভালো, করিনি আদর,
করিনি যতন বুঝি হৃদয় ভরিয়া,
লাগিল কোমল বুকে সেই অনাদর
তাই মা গো অকারণে গেলি কি সরিয়া ?
নাহি দিলি অবসর শোধিবারে ভুল,
না করিলি দয়া মাগো, ফেলে গেছ চলি ?
ঝরিল প্রভাতে ফুটি প্রভাতের ফুল
না চাহিল কারো পানে, গেল অবহেলি।

ফোটে ফুল, ঝরে যায় কিন্তু কি বিস্ময় !
কেন কাঁদি বুঝিনা ত—শুধু অন্ধকার—
যত চাই তত পাই—শুধু তমোময়
গভীর রহস্য-ভরা মৃত্যু পারাবার—
ওঠে আর পড়ে শুধু-কালের তরঙ্গ,
কেহ কোন কালে কভু বোঝেনি সে রঙ্গ।

(৬)

কহিল মঞ্জুলি কাঁদি—কোথা গেল মণি ?
মা কহিল অশ্রু জলে—'ডাক্তারের বাড়ী'—
'কে দেখিবে তারে মাগো কাঁদিবে যখনি ?
যাবনা মা বাড়ী আমি তারে হেথা ছাড়ি'
অশ্রু ধারা ঢাকি মাতা কহেন কাতরে,
মঞ্জুরে বক্ষেতে চেপে মুখে চুমো দিয়ে,
কেঁদ না মা মিছেমিছি, সে রবে আদরে,
ভাল যবে হবে তবে যাবো তারে নিয়ে।

রয়েছে আদরে বটে, ডাক্তারের ঘরে,
আছে ভালো, শুধু আর আসিবে না ফিরে,
মঞ্জু শুধু বসে বসে কাঁদে তার তরে
শ্রাবণের ধারা নামে চোখ দুটি ঘিরে।
বিশ্বের ডাক্তার তুমি, করিনে নালিশ,
দিও শুধু ছোটদের ব্যথার মালিশ।

(৭)

পড়েছ অনেক শাস্ত্র, শুনেছ অনেক,
বল কেন ফেলে গেলে গীতা মণি মোর ?
কাতরা জননী পানে চাহিনু ক্ষণেক,
শুষ্ক চোখে অশ্রু তার আনে উষ্ণ লোর।
কহিলাম—কিবা জানি ? জনম মরণ
অনন্ত রহস্য ভরা হেঁয়ালি গভীর,
না জানে উত্তর কেহ, প্রশ্ন চিরন্তন
মানুষেরে চিরকাল করেছ অধীর।

প্রভাতে আলোক জাগে, অন্ধকার সাঁঝে,
তারি মত জন্ম চলে মরণের পিছে ;
আমরা বুঝিনে কিছু—হৃদয়েতে বাজে,
সহিতে হইবে শুধু—কাঁদ কেন মিছে ?
নিরুত্তরা জননীর নীরব আনন—
কহিল আমারে যেন মিথ্যা এ ভাষণ।

(৮)

তত্ত্বকথা জননীরে কি দিবে সান্ত্বনা ?
তর্ক শুধু তর্ক থাকে নিষ্ফল জল্পনা,
জানে না সে, বোঝে না সে, মায়ের লাঞ্ছনা,
সে শুধু বুদ্ধির দ্বন্দ্ব—অলীক কল্পনা।
অতীন্দ্রিয় জগতের অতীন্দ্রিয় বাণী—
সেই সত্য বুদ্ধি দিয়ে কেমনে জানিব ?
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কভু যদি জানি
হৃদয়ের মাঝে তারে হয়ত মানিব।

অন্তর কাঁদিয়া মরে, জানি তাহা জানি,
কোনো শাস্ত্র কোনো তত্ত্ব শান্তি নাহি দিবে
তরঙ্গ দোলায় যেন দোলে চিত্তখানি—
না জানি পাথারে কোন ভাসাইয়া নিবে ?
হেরি চোখে জীবনের অফুরন্ত গতি—
চলে শুধু অবিরাম, নাহি জানে যতি।

(৯)

ফুটেছিল মুখে শুধু আধ আধ ভাষ,
অস্ফুট কাকলি যেন বিহগের মুখে,
কলকণ্ঠ কোথা সেই ? কোথা সেই হাস ?
জগদ্দল শোকরাশি জেগে আছে বুকে।
পীড়ায় কাতর হয়ে 'বাবা বাবা' বলে
ডাকিতে যখন মা গো অভাগা আমারে,
সে ডাক আড়াল ভাঙ্গি যেত না ত চলে
দূর দেশে আমি যেথা আছিনু আঁধারে।

কাল ব্যবধান ভুলি, আজ সেই ডাক
কাণে যেন আসে মোর—করুণ ব্যাকুল,
আজ আর নাই নাই, নাই কোন ফাঁক,
দেশ কাল সরে গিয়ে করিছে আকুল।
জানি মাগো জানি বটে একান্ত সে ভুল,
তবু এই ভুল মোর সম্পৎ অতুল।

(১০)

"একান্ত নিষ্ঠুর তুমি পাষাণের মত,
চোখে নাহি ঝরে জল, হেন গুরু শোকে,
অভাগী আমার মত নাহি ভাগ্যহত,
দেখিবে আমার দুঃখ নাহি কেহ লোকে।"
শোকাকুলা হে জননী। তোমার উচ্ছ্বাস—
জানি মর্ম্ম বেদনায় উষ্ণ হয়ে জ্বলে,
অন্তর্গূঢ় শোক মোর না জানে প্রকাশ,
সে শুধু গোপনে রয় তপ্ত বক্ষ তলে।

লঘু তব ব্যথা রাশি করিছে রোদন,
সান্ত্বনা আনিছে বহি তপ্ত অশ্রুধারা,
আমার জমাট শোক না জানে মোচন,
নয়নের বারি রাশি নয়নেতে হারা।
অনন্ত তোমার ব্যথা? হয়ত বা হবে—
অব্যক্ত আমার ব্যথা অব্যক্তই রবে।

(১১)

ক্লান্ত হয়ে কর্ম্ম হতে ফিরিতাম যবে,
ডাকিতাম শ্রান্ত কণ্ঠে মা' মা বলি তোরে,
অমনি ছুটিয়া আসি' ব্যস্ত কলরবে
মিঠা হাসে বাঁধিতিস্ আদরের ডোরে।
আজ পরিশ্রান্ত চিতে ফিরিলে ভবনে
নাহি সেই কলরব, নাহি সেই হাসি,
প্রেমের কাজলখানি মাখায়ে নয়নে
সহসা কোথায় গেলি ওরে সর্ব্বনাশী!

যদি দুঃখ দিবি এত কেন তবে এলি?
কেন তবে বুক ভরে দিলি ভালবাসা?
ভালবাসা দিলি যদি কেন চলে গেলি?
কেনরে ফুটিতে গিয়ে ফুটিল না আশা?
কে দিবে উত্তর? হাসে শুধু প্রতিধ্বনি,
নির্ম্মম কৌতুক করে, ব্যথা নাহি গণি?

(১২)

আজি তীব্র শোকগাথা কেন মিছে গাহি ?
আসিবেনা ফিরে সে ত ধরণীর তীরে
দুস্তর নির্ম্মম কালের সাগর বাহি,
রাখিবেনা আর কভু স্নেহ দিয়ে ঘিরে।
বুদ্ধির শাসন বাণী হৃদয় না মানে,
সে শুধু কাঁদিয়া মরে, করেনা বিচার,
হৃদয়ের গতি ধারা কেবা কবে জানে ?
কত দিকে কত মুখে করিছে সঞ্চার।

কিন্তু মিছে কিগো হৃদয়ের আকুলতা ?
মিছে কিগো হা হুতাশ জাগে মর্ম্ম মাঝে ?
একি শুধু অন্তরের হীন দুর্ব্বলতা ?
সত্যেরে এড়ায়ে চলে নাহি আসে কাজে ?
হৃদয় রহেনা বসি, তর্ক নাহি মানে,
নিজেরে ভুলায়ে রাখে সকরুণ গানে।

(১৩)

সংসার রয়েছে মাগো তীব্র দাবানল,
নৃশংস হিংসার বিষ হীন কুটিলতা,
রয়েছে লুকায়ে কত বিদ্বেষ গরল,
কত মিথ্যা হানাহানি, কত মলিনতা,
তাই কি চলিয়া গেলি ফিরাইয়া মুখ,
সহিলি না জীবনের মর্ম্মান্তিক জ্বালা,
তরাসে উঠিল ভরি সুকোমল বুক—
বহিলি না তাই তিক্ত বেদনার ডালা।

এ জীবন নহে মাগো ! গোলাপের মালা,
পদে পদে বাধা আছে, অসহ যাতনা,
শয়তানী উপহাস, দুর্ব্বিষহ জ্বালা,
মরু সম পুড়ে যায় প্রাণের কামনা—
কেমনে মা বুঝি নিলি মিথ্যা ব্যর্থতারে ?
চলে গেলি চূর্ণ করি সেই শূন্যতারে।

(১৪)

কে বলে জীবনে আছে মহা সার্থকতা ?
অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ সে ত দুঃখ নয়,
অন্ধকার আলোকের গৌরব বারতা,
বিরোধেই মানুষের বীর্য্য পরিচয়।
সমস্ত দ্বন্দ্বের মাঝে মঙ্গল মহান্
অলক্ষ্যে আপন দীপ্তি করিছে বিস্তার, :—
এ শুধু অলীক স্বপ্ন, কল্পনার দান,
চেপে রাখে দুর্ব্বলের রিক্ত হাহাকার।

ওরে ভ্রান্ত খোলো চোখ, দেখ আঁখি মেলে,
মিথ্যার বিজয় যাত্রা চলিছে গৌরবে,
সত্যের প্রকাশ একেবারে মুছে ফেলে
দিগন্ত ভরিয়া রাখে আপন সৌরভে।
ভক্ত তবু যুক্ত করে মিথ্যা জয় গাহে,
যত মরে, তত মরে, তবু নাহি চাহে।

(১৫)

কোথা দয়া ? কোথা মায়া হিংস্র ধরণীতে ?
নির্ম্মম, ভীষণ, ক্রূর দুঃখ দুর্নিবার ;
প্রকৃতি রাক্ষসী ভীমা লোলুপ শোণিতে
করাল বদন রাখে করিয়া বিস্তার।
জ্বলন্ত পাবক মাঝে পতঙ্গের মত,
মায়ামুগ্ধ শশসম অজগর গ্রাসে,
জগতের লোকারণ্য ছোটে অবিরত—
দুর্ব্বার মৃত্যুর পানে অন্তহীন ত্রাসে ।

কঠোর সংগ্রাম এই চলে অহর্নিশ
নাহি জানি তবু কেন রাত্রি দিন ধরি,
আকুল আগ্রহ ভরে পান করি বিষ,
কত চেষ্টা কত যত্ন নাহি যেন মরি ;
এ জীবন একান্তই তিক্ত পরিহাস,
তবু নাহি ঘুচে মাগো মায়া-নাগপাশ।

(১৬)

দয়াময় বিধাতার সৃষ্টি এই ধরা
অলঙ্ঘ্য নিয়মে তার নিত্যদিবা বহে,
অমোঘ বিধান তাঁর সত্যে জ্ঞানে ভরা,
সর্ব্ব বিবর্ত্তন মাঝে চির স্থির রহে।
একথা সুন্দর বটে হৃদয় মোহন,
কিন্তু সত্য নহে মাগো কভু সত্য নহে,
এ শুধু আঁধারে রাখে করিয়া গোপন,
ব্যথাহত দুঃখিতেরে মিষ্ট কথা কহে।

সমস্ত জগত মাঝে যে তাণ্ডব লীলা
চলে নিশিদিন সে নহে কল্যাণ ধৃত,
বিষ বাষ্প অমৃতের গ্রাস করে নীলা,
অন্ধকার করে সদা আলোকে আবৃত,
নিরুদ্দেশ গতি এ যে, লক্ষ্যহীন যাত্রা,
নাহি ছন্দ, নাহি সুর, নাহি কোনো মাত্রা।

(১৭)

খেয়ালী প্রকৃতি রাণী চলিছে খেয়ালে,
অন্ধ জড় শক্তি সে যে প্রেম নাহি জানে,
সে শুধু আঁকিছে ছবি বিশ্বের দেয়ালে,
আপন রুচিতে, বিধানেরে নাহি মানে।
জনম মরণ যেন তার হাতে পাশা,
ওঠে পড়ে' খেয়ালেতে, নাহি অর্থ তার
কৌতুক যখন জাগে, বাঁধি হেথা বাসা।
কৌতুক ফুরালে চলি—মৃত্যু পারাবার।

অর্থ হীন খেয়ালের কিবা অর্থ আছে।
এ শুধু নিষ্ঠুর দৈব, নির্ম্মম নিয়তি,
তার কাছে নত চি[illegible] [illegible]কবা কৃপা যাচে ?
না আছে হৃদয় তা[illegible] [illegible] শোনে মিনতি।
অন্ধ জড় শক্তি—[illegible] অন্ধ ক্রীড়নক,
রব মৌন স্থির, র[illegible] [illegible] নিষ্পলক।

(৮)

সে শুধু নীরবে রয় নাহি কয় কথা,
নাহি পশে তর্ক জাল ব্যথিত অন্তরে
কোথা পথ যাতে যায় স্তব্ধ কাতরতা,
চলে যায় যত ক্ষোভ একটি মন্তরে।
কত দিকে কত মুখে কত বার্ত্তা আসে—
হৃদয় ঘোলায়ে যায়—তত্ত্বের আবর্ত্তে,
তরঙ্গেতে ভেলা যেন দিকে দিকে ভাসে
কোথায় আশ্রয় সত্য—দুঃখ ক্ষীণ মর্ত্ত্যে ?

জানা পথ, জানা মত, শুনি বার বার,
সত্য বলে মানে জাগে, আবৃত্তির ভারে—
অজানা সে ভয়ঙ্কর অন্ধ পারাবার,
সে থাক গোপন হয়ে, কে বরিবে তারে ?
অয়ি ক্ষুব্ধে ! কেন ভীরু অজানা বরিতে,
আজ জানা, ছিল কাল অজানা মহীতে।

(১৯)

তুমি জ্ঞান তর্কজাল বুদ্ধির আলোক,
আমার আশ্রয় শুধু নির্ভর বিশ্বাস,
নাহি জানি গবেষণা, তর্কের পুলক,
আমি চাহি দুঃখহারা গভীর আশ্বাস।
আমিত পণ্ডিত নহি, নাহি বুদ্ধিগর্ব্ব,
তর্ক প্রিয়! এ জীবনে আনিবে কি শান্তি,
শোকের দংশন জ্বালা করিবে কি খর্ব্ব?
ঘুচাবে কি হৃদয়ের সর্ব্ব মোহ ভ্রান্তি?

মোর অশ্রুজল তাই ঢালি তাঁর পায়
অপার কৃপায় যাঁর চলিছে জগৎ,
যাঁর মহিমার নীতি চরাচর গায়
অতুল উদার যিনি, পরম মহৎ,
শোক সর্প চলে যাবে নত করি ফণা,
যদি পাই তাঁর কাছে অমৃতের কণা।

(২০)

অটুট থাকুক প্রিয়ে! তোমার বিশ্বাস,
শান্তি যদি পাও তুমি ক্ষতি কিবা তাহে,
দুর্ব্বল প্রাণের মাঝে দুর্ব্বল উচ্ছ্বাস
মিথ্যা আশ্রয়েরে সখি দিবানিশি চাহে।
অন্তহীন সীমাহীন জগৎ মাঝারে,
লক্ষ লক্ষ তারকার আবাস ভবনে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া আছে অসীম পাথারে,
স্তব্ধবাকে স্তব্ধচিত্ত বিস্মিত নয়নে।

তার মাঝে কোথাও কি শক্তি জ্ঞানবান্
রয়েছে লুকায়ে নিজে আপন প্রভায়,
নাহি নাহি নাহি তার কোনই সন্ধান,
আমরা ঘুরিয়া মরি মোহের কারায়।
শক্তি আছে জানি তাহা, হয়ত সে জড়
বাধা দিয়ে মানুষেরে করেছে সে বড়।

(২১)

তোমার গীতারে প্রিয়ে, সত্য তুমি চাও ?
দিতে পারি তারে আমি, জানি মন্ত্রখানি,
নাহি চাহি পূজা তপ, শুধু চিত্ত দাও,
নাহি চাহি যাগযজ্ঞ, কিংবা শাস্ত্রবাণী।
হাসিছ উপেক্ষা ভরে, বিশ্বাস না জাগে,
ফঁকি নয় ফাঁকি নয় সত্য দিতে পারি,
আবার আদর ভরে স্নেহে অনুরাগে
পাবে তারে বক্ষ মাঝে, চুমো খাবে তারি।

অর্ঘ্য নিয়ে অজানার পায়ে ঢালা মিছে,
মিছে ওরে মন্ত্রপাঠ করুণার লাগি,
হতাশা রয়েছে সখি ! সেই আশা পিছে
অসত্যেয় চাপ খুলি ওঠ আজ জাগি,
নির্ভীক সুদৃঢ় চিত্তে চাহ ধরা পানে,
লহ ধরণীর সুখ দুখ ভরা গানে।

(২২)

সরল গরলহীন আন ভালবাসা,
স্নেহময় প্রেমময় আনো চিত্তখানি,
তার পর উর্দ্ধ হতে নীচে বাঁধ বাসা,
তোমার গীতারে প্রিয় ! সত্য দিব আনি ।
ধূলি ধূসরিত ধরা জননীর গেহে,
আমরা মানুষ বেঁধেছি ধূলির বাসা,
ঝড়ে উড়ে পড়ে, কাঁপুনি লাগে যে দেহে,
তবু চলি মোরা তবু ত ছাড়িনে আশা ।

কে রাখে বাঁচিয়ে প্রিয় ! কে দেয় সান্ত্বনা ?
সম্পদে বিপদে কিংবা জয় পরাজয়ে,
সুখে দুঃখে কে ঘুচায় প্রাণের লাঞ্ছনা ?
জীবনের গুরুভার কেবা নেয় বয়ে ?
সে নয় দেবতা প্রিয়, ধূলির মানুষ—
মানুষের পানে চাও চেওনা ফানুস ।

(২৩)

গুহার আঁধারে ছিল পশুর মতন,
নাহি ছিল খাদ্য তার, না ছিল ভবন,
না ছিল আশ্রয় বস্ত্র, না ছিল বসন
পথে পথে হানা দিত করাল শমন।
কে দিল আগুন আনি, কে জ্বালিল আলো,
কে বাঁধিল ঘর দোর, কে চষিল বন
ভয়ের বাসায় কেবা অভয় বিলালো ?
সে নয় দেবতা সখি !—মানুষের মন।

যে দিন দেবতা গড়ি নিজেরে ভুলালো,
আপনার সর্ব্বনাশ নিয়ে এলো ডাকি ;
অজ্ঞানের অন্ধকারে সহসা ঘুমালো,
মৃত্যু তন্দ্রালোকে সেই বুঝিল না ফাঁকি।
ফিরে চাও ফিরে চাও মানুষের পানে,
ফিরে আন ফিরে আন অমৃতের গানে।

(২৪)

কচি কচি ওই যত ফুলগুলি হাসে,
মানুষের দুঃখ ভরা ধূলির অঙ্গনে,
কত যে বেদনা পায়, কত মরে ত্রাসে,
ওরাই বাঁচায় তবু আশার অঞ্জনে।
চেয়ে দেখ উহাদের কচি কচি মুখে,
গীতার হাসির রেখা উঠিছে না ফুটি ?
ওই যে বাড়ায়ে বাহু, আশা ভরা বুকে,
মোহন মধুর ভাষে আসে পাশে ছুটি।

এনেছে ওদের কেহ গীতার ভঙ্গিমা,
কেহবা এনেছে তার মধুর চলন,
পেয়েছে কেহবা তার কৌতুক রঙ্গিমা,
কেউ বা নিয়েছে তার চঞ্চল নয়ন,
এক গীতা খেলে আজ শত গীতা হয়ে,
ভুলায় হৃদয় মন শত কথা কয়ে।

(২৫)

লহ ব্রত কল্যাণের হে কল্যাণি মোর !
সেবায় সুন্দর কর শিশুর জীবন,
মুছে ফেল নয়নের তীব্র তপ্ত লোর,
চারিদিকে কর সখি হাসির বীজন।
যে হাসি গীতার মুখে বিজলি-ঝলক,
যে মধু মাধুরী তার ছিল অঙ্গে অঙ্গে,
চারিভিতে ছড়াও সে আলোর চমক,
দেখিবে সে এসে গেছে কি জানি কি রঙ্গে !

কাল ছিল ছোট হয়ে সীমার আড়ালে,
আজ সে যে গেছে প্রিয় ! জগতে ছড়ায়ে
খুসি মত পাবে তারে হাতটি বাড়ালে,
যত খুসি রাখ তারে বুকেতে জড়ায়ে।
হবেনা নিঃশেষ উদ্গলিত স্নেহধারা—
যত দেবে তত পাবে, নাহি হবে হারা।

———

মৃত্যুর আড়াল

সে এসেছিল ফুলের মত।

পল নিরনের বিকচ ফুলে উদ্যান আলোকিত—মালঞ্চে এলামণ্ডার হরিদ্রাভ পুষ্পস্তবক বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—রজনিগন্ধার ডবল ফুল গন্ধ ছড়ায়—এই শোভা ও সৌন্দর্য্যের মাঝে সে এল শরতের আলোর মত শুভ্র, ফুলের মত সুন্দর।

প্রভাকে হেসে বল্লাম—কন্যারত্ন উপহার দিয়েছ?

ওর মুখ লজ্জা ও ক্ষোভে লাল হয়ে ওঠে—বলে "মেয়ে কি উপেক্ষার?"

উপেক্ষার নয় জানি। মেয়েরা শান্তি দেয় ঘরে, আলো দেয় অন্ধকারে, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়ে আপনার দর জানে না—তাই সে উপেক্ষিতা। বহু কালের সমাজ ব্যবস্থা—পিছনে রয়েছে সনাতন আদর্শ—তর্ক করা মুস্কিল—আদর করে নাম দিলাম—'গীতা।'

গীতা—নামটি হয়ত ভুল হয়েছিল—যে নাম হয়েছিল নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যার বাহিকা—সংসারের প্রয়োজনে হয়ত সে নাম নয়, কিন্তু পিতার হৃদয় এত বোঝে না।

প্রভার নামকরণ ভাল লাগিল—।

প্রভা জানে আমি গীতাকে ভালবাসি—গীতার শ্লোক আমার কণ্ঠে—গীতার মর্ম্ম আমার লেখায়—গীতার তত্ত্ব আমার জীবনের আদর্শ—তাই ও খুসি হয়ে ওঠে। কন্যার জননী হওয়ার দুর্ভাগ্য ভোলে—।

গীতা বেড়ে ওঠে দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত।

চন্দ্রকলার মত জ্যোতি—চন্দ্রকলার মত হাসি—ও হাসি দশটায় আফিসের পথে পথ ভোলায়—কর্ম্মশ্রান্ত দিবসের শেষে শান্তি যোগায়।

শিশুরা ভাগবত জীবনের স্পর্শ পায় যে কবি একথা লিখেছেন তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন—টাকা আনা পয়সার যোগ বিয়োগ নিয়ে যে সংসার চলে, সে সংসারে শিশুর শুভ্র হাসির মত অমূল্য জিনিষ কি আর আছে।

কিন্তু অমূল্যকে পেয়ে তার মর্য্যাদা ক'জনে দেই?

অমূল্যের অনুভূতি আমাদের সংসারী মনে স্থান পায় না—তাই আমরা ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ ঘোরা ফেরা করি।

প্রভাকে বলি—আমায় ছুটি দাও—যাই বিরাট পৃথিবীকে দেখে আসি—

ও ভাবে কৌতুক—জানে পারবনা যেতে—স্নেহের বন্ধন ও প্রেমের বন্ধন হবে পথের কাঁটা।

কিন্তু আমার মনের মাঝে রয়েছে দুরন্ত দৌরাত্ম্য—সে ছাড়া চায়—স্বস্তির ও মাধুর্য্যের পরিবেশ ছেড়ে সে অজানার সাথে লেনদেন করতে চায়—তাই সত্যই বাহির হয়ে পড়লাম—

হাওড়া ষ্টেশনে সে দিনের ছবি এখন চোখে জাগছে—

প্রভার সজল চোখে বিষাদের কালো মেঘ—কিন্তু গীতা হাসছে—ও জানেনা বিদায়ের দুঃখ—তবু ওই হাসিটাই মনকে বিহ্বল করে—

চলন্ত পথিকের মনে মায়া জাগে—

গাড়ী সময় মানে—হৃদয় মানে না, তাই সে চলে—সে জানে গতির মন্ত্র—সে জানে চলার প্রীতি।

পিছনে সজল কালো চোখ আর উদ্বেল হাসি—অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব—কবির কাব্যের উৎস—কিন্তু মন বেদনায় মুহ্যমান হয়ে ওঠে—

অল্প নিয়ে যার পুঁজি—সে যে তাকে ছাড়তে পারে না—কাছে কাছে চোখে চোখে রাখবার দায় তার।

(২)

যুরোপের লীলাচঞ্চল কর্ম্মোজ্জ্বল নগর ও নগরী—

চোখে পড়ল প্রথম ভিনিসের আলো—শান্ত সমুদ্রের কোলে খালের পর খাল চলেছে—আর তার দুপাশে গড়ে উঠেছে আড্রিয়াতিক প্রেয়সী—ভিনিসিয়া।

ভিনিস, মিলান, লুসার্ণ, প্যারি, লণ্ডন, বার্লিন, অস্‌লো, প্রাহা ও ভিয়েনা—

এদের বিভিন্ন বিচিত্র রূপ।

এই ঐশ্বর্য্যের ছবি—এই বিলাসের লীলা নিকেতনে অন্তরের যোগ নেই—তবু তার মাঝে ঘুরি—ভাবি আর জানতে চাই—কোথায় এই জাগরণের চাবিকাঠি, কিন্তু প্রভার চিঠি আসল হাস্যময়ী গীতার অসুখ।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে মন ছুটে আসে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে।

বাঁশবনে ছাওয়া পথ—জঙ্গল ঘেরা বাড়ী—পঙ্কিল সলিল, এইত আমাদের আদর্শ গ্রাম। আর সেই আদর্শ নীড়ে আমাদের আদর্শ নর ও নারী।

মন ব্যথায় ভরে ওঠে—শঙ্কা ও চিন্তায় উদ্বেগের অন্ত থাকে না।

আর খবর পাই না—দিনের পর দিন অশান্ত চিত্তে চেয়ে থাকি ডাকের পানে—সে আনে না বার্ত্তা।

চিঠি পেলাম অনেক কাল পরে—গীতা ভাল হয়েছে কিন্তু তারপরে ওর কথা কোনও চিঠিতে পাই না—

এ হেঁয়ালির অর্থবোধ কষ্টকর—ভাবি আলস্য অথবা ঔদাসীন্য—

মনের ভিতর একটা অজানা শঙ্কা। জাগে, তবু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরি—

য়ুরোপে দেখি প্রাণের প্রচণ্ড স্রোত—ওখানে মানুষ বসে নেই—আমাদের মত অকর্ম্মা জড়ভরতও ওদেশের আবহাওয়ায় সতেজ ও কর্ম্মী হয়ে ওঠে।

চলছি যাযাবর পথিক—আজ এখানে দুদিন, কাল ওখানে—কাজেই বাড়ীর সাথে যোগ যথাসত্বর সম্ভবে না।

চলছি—চলার পথে প্যারিতে দেখা হল এক পলায়িত স্প্যানিশ দম্পতীর সঙ্গে—এক হোটেলের আবহাওয়ায়। আমি ফরাসী জানিনে—কাজেই খাওয়ার টেবিলে বিপদে পড়ি—এরা আমায় সাহায্য করে—

ওদের ছোট ছেলে মেয়ে দু তিনটি—

তাদের দেখি আর তাদের লীলাকল্লোল শুনি—আর মন ছুটে যায় বাংলা দেশে—

পিতার ব্যাকুল হৃদয়ের মমতা, কিন্তু ভাববার সময় নেই—চলি চলার পথে—দিক দিগন্তরে।

মাস কয়েক পরে ঘরে ফিরব—দেহে এসেছে স্বাস্থ্য—মনে এসেছে স্ফূর্ত্তি—হৃদয়ে জেগেছে কল্পনা—ভাবছি

আমাদের দেশে ফিরে মানুষের মনে বাঁচবার আনন্দ জাগাতে হবে—কর্ম্মের পুলক জাগাতে হবে—

বাড়ীর চিঠি পেয়েছি—ওরা সবাই ভাল।

মনে হয় জাহাজ যেন চলছে না—জলরাশির উদ্বেল তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠে—মনে হয় ও যেন পথ দিতে চাইছে না—ভাবি সময়ের এত দাম কেন—যখন তাকে চাইনে—সে কেন চলে যেতে চায় না তাড়াতাড়ি তার পাখা দুটি মেলে—উধাও হয়ে—

বোম্বে এসে দেখলাম ভারত মায়ের লক্ষ্মীরূপ—কি সুন্দর দেশ—কি সোনার রোদ—কি সুন্দর আলো—য়ুরোপের আকাশে বাতাসে এত মাধুর্য্য নেই—এদেশ কবির ভাষায় সকল দেশের রাণী—

বন্ধুরা পথে থাকতে বলে দিলেন—কিন্তু সে উপরোধ মানবার মত মনের অবস্থা নয়, মন অশান্ত ব্যাকুল—সে প্রিয়জনের দর্শন আশায় উদ্বিগ্ন, সে সমাদরের লোভে লোভী নয়—তাই বোম্বে মেলের প্রথম গাড়ীতেই দেশে রওনা হলাম—

(৩)

ফিরেছি দেশে—

কিন্তু কি অভিজ্ঞতা।

যে হাসি ফুটেছিল, মর্ত্ত্যে স্বর্গের ফুল—সে ফুল নিস্প্রভ ও ম্লান হয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঁদিনি, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি।

কিন্তু তবু কি পরিবর্ত্তন!

ভাল লাগেনা—পৃথিবীর এই দুর্ব্বার কর্ম্মোদ্যম—সে থামেনা, সে চলে—কিন্তু আমি যোগ দিতে পারিনে—আমি বসে থাকি নীরব হয়ে—লোকে বলছে—এইটাই শোক—

যে গেছে তার কথা চিন্তা করিনে—তার জন্য অশ্রুপাত করিনে—কিন্তু তবু এ অবসাদ কেন?

মাঝে মাঝে মনে হয় এ বিদ্রোহের সুর—এই যে সৃষ্টির সম্পৎ—এর অপচয়ের কারণ বুঝিনে—তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ব্যাকুল হৃদয়—

তত্ত্বজ্ঞানী বন্ধুর উপদেশ পেলাম—মৃত্যু ক্ষণিকের আড়াল—প্রিয় জনের সাথে মিলন হবে একদিন—নূতনতর জগতে, নূতনতর—পরিবেশে—কিন্তু এ যেন সান্ত্বনা দেয় না—

গীতার মৃত্যু জীবনের সাথে ব্যবধান গড়েছে—

ভিতরে পূর্ণোদ্যমে অভিনয় চলছে—কিন্তু আমার চোখে যেন যবনিকা—তার আড়াল দিয়ে আমি এই

আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারছিনা—প্রভা ও আমার মাঝে ও যেন গড়ে উঠেছে সঙ্কোচ ও আড়াল—

দুজনে আর যেন পরস্পরের নাগাল পাই না—

ও যেন হেঁয়ালি—

হাস্য কল-কৌতুক মাঝে মাঝে জাগে—কিন্তু তার মাঝে যেন সত্যকার প্রাণের স্ফূর্ত্তি নেই—

য়ুরোপের পথে দার্শনিক বান্ধবী মিলেছিল—

তাঁর রূপ যেমন মধুর, জ্ঞান তেমনই বিশাল—তাঁর কথা পেলাম চিঠিতে—তিনি লিখেছেন—মৃত্যুকে যদি মৃত্যু বলে দেখেন—তবে ভুল দেখবেন—জন্ম ও মৃত্যুর ছন্দ—ওঠা ও নামা—ওঠাটার যেমন প্রয়োজন আছে—নামবার তেমনই প্রয়োজন—তা না হলে সুর জাগত না—হর্ষ ও বিষাদের বেয়াড়া তাল মিলেই জীবনের সঙ্গীত ঐক্য তানে প্রস্ফুট হয়ে ওঠে—

প্রভাকে চিঠি পড়ে শোনাই ও বুঝতে পারে না—ও বলে আমি এসব বুঝিনে—

আমি কি বুঝি? বুঝিনে—বড় বড় কথা শিখেছি—তারই ঘটা করি—এটা অভ্যাস—আসল অনুভূতি নেই—

কিন্তু এ কথা—এ বেদনা অপরের নয়—

প্রভাত তার আলো নিয়ে হাসে—রাতে তারার

বাহার জাগে—কাননে ফুলের মেলা চলে—পাখীরা ডাকে—সব সচল—জগতের যিনি মালিক—তাঁর উৎসব ঘটার বিরাম নেই—

এর পিছনে ছুটি প্রাণী—ভাগ্যহত স্বামী ও স্ত্রী—শুধু কি বিষাদের ডালি সাজাবে ?

বলি—শোক করোনা—সে গেছে স্বর্গে—

প্রভা হাসে—

কারণ—জানে আমি নাস্তিক—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই মিথ্যা কাহিনীকে মানিনে—

কিন্তু কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান—কার উপরে দাঁড়াব ? কে দেবে সান্ত্বনা ? কে দেবে সত্যের জ্যোতিশিখা—

প্রভা বলছিল—আচ্ছা তুমি কি বিদেশে কখনও বুঝতে পারনি—যে গীতা নেই ? আমি বলি—না—

ওকে স্বপ্নেও দেখ না ?—

তাও দেখিনে।

প্রভা বলল—সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে—দেখে গীতা এসেছে— হাসছে—

জানি এ মমতাময়ী মাতার চিত্ত-বিভ্রম !

কিন্তু বিভ্রমই কি সত্য ?

না জ্ঞানী সাজবার মূর্খতা করব না—কতটুকুই বা

জানি—এ জগতের কত জিনিষ কত সত্য—সে রয়েছে জ্ঞানের পরিধির বাহিরে—

আচ্ছা যদি প্রভার মত অবুঝ বিশ্বাসী হতে পারতাম—

মনে জাগে শুধু সংসারের বেড়াজাল—

পাইনে কোথাও আলো—জ্ঞান ও বিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে থাকে—তার বাইরে শুধু ঘন কুয়াসার কুজ্ঝটিকা—

অস্পষ্ট দৃষ্টি চলেনা—

কিন্তু—চুপ করে আড়ষ্ট হয়েই কি থাকব ?

দার্শনিক বন্ধুর কথা কাণে বাজে—জীবনের বিশাল বৈচিত্র্য তুমি দেখেছ—এই বিচিত্রের সাথে নিত্য নূতনরূপে রসাস্বাদন এটাই জীবনের সত্যকার লক্ষ্য—কাজেই অবসন্ন হয়োনা—

বুঝি—এই কথাটাই ডাবলিন থেকে একটা চিঠিতে প্রভাকে লিখেছিলাম।

এই অনুভূতি—সমস্ত দ্বন্দ্ব ও কলহ কোনও দিন নিঃশেষ হবেনা—কিন্তু তারই মাঝে চলছে প্রাণের জয়যাত্রা—এই বোধকে জাগাতে হবে—

একথা আজ আমিও যেন বুঝতে পারছিনে—

প্রভা কেমন করে বুঝবে ?

মহাকাল আনবেন শান্তি—

হয়ত একথা ঠিক, সময় সর্ব্বংসহ, সে হয়ত এই বিষাদের বিষজ্বালা নিভাবে—

কিন্তু যতদিন না নিভাতে পারে—

ততদিন চলবে এই আড়াল—

তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই—

তার কোনও উপায় নেই—

প্রভা হাসল—অনেক দিন ভুলে যাওয়া ছবি আঁকতে বসল—ও কাচের গায়ে বাঁচাবে হারা মণিকে—

এইত ফাঁকি দিতে পারব—মৃত্যু বড় নয়—মানুষের আর্ট—মানুষের শিল্পবোধ—সে মৃত্যুর চেয়ে বড়—সে আনে অমরত্বের বাণী—

আমিও বললাম—আড়াল আড়াল নয়—আমি আঁকব জীবনের বাণী—

আনো বীণা—বাঁধো সুর—আমি গাইব গান—

কিন্তু এইটুকুই—প্রভার তুলি চলে না—আমার কণ্ঠও সুর তোলে না—

হায়! এইটাই সত্য—এইটাই বাস্তব।

নব্যা

নাটিকা

আধুনিক জীবনের

ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে তরুণ

কেমন করিয়া

তরুণীর প্রেমপাশে

আবদ্ধ হয়

তাহারই নিখুঁত ছবি।

সংলাপ, ঘটনা-সংস্থান, অনবদ্য

অপূর্ব্ব।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শিব-সাহিত্য কুটীর

২৬।৮ এ হ্যারিসন রোড

কলিকাতা।

শিশুমনের চলচ্চিত্র

শ্রীমতিলাল দাশ। শিব-সাহিত্য কুটীর। ২৬৮এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোটদের পাঠোপযোগী যে সমস্ত বই আজকাল প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব অথবা অস্বাভাবিক এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীতে ভরা। শিশুমনের প্রকৃতরূপ, শিশুর ভাবনা কামনার স্থান তাহাতে নিতান্ত অল্প—প্রায়ই সম্পূর্ণ উহ্য এক কথায় আমাদের শিশুসাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যি-কারের সাহিত্য হইয়া ওঠে নাই। শিশু-সাহিত্যের নামে যাহা বাজারে চলিতেছে, তাহা কতকগুলি আজগুবি ও অপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ মাত্র।

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের 'শিশুমনের চলচ্চিত্র' এদিক হইতে একটি নূতন দিকের নির্দ্দেশ দিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক অথচ জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া শিশু-মনের যে ছায়াছবি দুর্নিবার গতিতে বৃহত্তর মানবতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলে, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই রস-মধুর আলেখ্য। একটি কিশোর বালককে কেন্দ্র করিয়া মতিলাল বাবু বাঙ্গলার শিশুমনের যে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা শিশুদের টানিয়া লইবে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে, বয়স্কদের আকর্ষণ করিবে বর্ত্তমান হইতে অতীতের দিকে। 'শিশুমনের চলচ্চিত্র' তথাকথিত এ্যাডভেঞ্চার-বিলাসী শিশু-সাহিত্য ও প্রকৃত জীবন সাহিত্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —যুগান্তর